



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 54 - 63

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সমর সেনের কবিতাভাবনা ও কবিতার নন্দনতত্ত্ব

চিত্তরঞ্জন নস্কর

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ডোমকল গার্লস কলেজ

Email ID: chittaranjannaskar548@gmail.com

 0009-0005-9960-3112

Received Date 28. 09. 2025

Selection Date 15. 10. 2025

Keyword

Samar Sen,
poetic vision,
Aesthetics,
Modern Poetry,
Marxist Poetics,
Urban Middle
Class,
Romanticism and
Disillusionment,
Prose Rhythm,
Eliot Influence,
Social Realism,
Poetic
Consciousness.

Abstract

Samar Sen is a distinctive name in modern Bengali poetry, who wrote in the political and social context of the 1940s. His poetic vision was shaped by the despair of the urban middle class, self-reproach, the collapse of romanticism, sexual anguish, and a consciousness rooted in socialism. He believed that poetry is not merely the product of inner inspiration, but rather an artistic expression of social reality. Without a historical perspective, it is impossible to grasp the essence of poetry; and poetry without such a basis becomes a form of intellectual distortion. For him, poetry was a fusion of intellect and emotion, and in his works he represented the decaying middle class.

His language is abstract, rhythm based on prose, and thought restrained. In Samar Sen's poetry we find the ugliness of urban life, class-consciousness, political uncertainty, and the disillusionment of romanticism—all expressed with profound artistry. Though influenced by Rabindranath Tagore and T.S. Eliot, his poetic thought remained internalized and progressive. The crises and inner conflicts of the middle class formed the central elements of his poetry, which achieved artistic shape through prose rhythm in a classical poetic language.

Discussion

বিশ শতকের চারের দশকের কবি সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) আধুনিক বাংলা কবিতায় স্বতন্ত্র এক নাম। স্বতন্ত্র এই জন্য যে তিনি কাব্যচর্চা দীর্ঘদিন করেননি, প্রতিভা তাঁর ছিল; তবু মাত্র বারো বছর কাব্যচর্চা করার পর সাহিত্য জগৎ থেকে - মূলত কবিতার জগৎ থেকে প্রায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। মাঝেমধ্যে একটা দুটো কবিতা তিনি লিখেছেন।

আমরা আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই সমর সেনের কবিতা-ভাবনা এবং সেই ভাবনা কীভাবে তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে - অর্থাৎ কবিতা ভাবনা কীভাবে কবিতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে এই বিষয়ের মধ্যে।

তবে সেই আলোচনায় প্রবেশ করার আগে জেনে নিতে চাই কাকে বলে কাব্যচিন্তা? - নন্দনতত্ত্বই বা কী?

কবিতা নিয়ে সমর সেনের চিন্তাভাবনা কী, সেই চিন্তা কীভাবে তাঁর কবিতায় প্রয়োগ করা হয়েছে - এই প্রয়োগের ফলে তাঁর কবিতা শিল্পের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়েছে কি না - এই সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর কবিতার নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্য তত্ত্ব (Aesthetics)।

কবিতা সম্পর্কে তাঁর সুসংবদ্ধ চিন্তাধারাই তাঁর কবিতায় যত সুন্দর ভাবে প্রয়োগ লক্ষ করা যাবে ততটাই তাঁর কবিতা নান্দনিক সৌন্দর্যের প্রকাশিত রূপ। কাব্যচিন্তা আর নন্দন তত্ত্ব তাই মিথোজ্ঞিয়ায় চলা দুই পরিভাষা।

আসলে কবিতা নিয়ে কবির ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা যখন তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয় এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তখনই সেটা হয় তাঁর কবিতার নন্দনতত্ত্ব। কবির চিন্তার নান্দনিক প্রকাশ। এই নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) বিষয়টি একটি দার্শনিক পরিভাষা। দর্শনের একটি শাখা যা সৌন্দর্য-রুচি শিল্প এবং অনুভূতির বিচার বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করে। এটি বোঝার চেষ্টা করে আমরা সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করি কীভাবে, কেন কোন চিত্রকর্ম দেখে আমরা মুগ্ধ হই। ভাষার সৌন্দর্য নাকি অলংকার নাকি দেহাতীত সৌন্দর্য-ধ্বনি, রসব্যঞ্জনা কাব্যকে কাব্য করে তোলে?

নন্দনতত্ত্ব মূলত সৌন্দর্যবোধ ও তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। ‘নন্দন’ অর্থাৎ সুখদ, সুন্দর, সৌন্দর্য, রূপমাধুর্য। ‘তত্ত্ব’ অর্থাৎ কোন কিছুর গভীর ও সুসংগঠিত ব্যাখ্যা। সুতরাং নন্দনতত্ত্ব-সৌন্দর্যের প্রকৃতি, মানদণ্ড প্রভৃতি সম্পর্কে সুসংবদ্ধ চিন্তাধারা।

মানব জীবনকে অনুকরণ করে প্রকাশিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও উপলব্ধি নির্ভর আনন্দ যখন ছন্দ- অলংকার - চিত্রকল্প, সুর- সংলাপ, রং-রেখা, প্রভৃতির সমন্বয়ে চিত্রসঙ্গীত ময়তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় এবং পাঠক রসাস্বাদন করে তখন সেই প্রকাশিত সৌন্দর্য বা ব্যঞ্জনাই হচ্ছে তার নন্দন তত্ত্ব। প্রাচীন ভারতীয় অলংকারিকদের ভাষায় এ আসলে ধ্বনিতত্ত্ব ছাড়িয়ে রসতত্ত্ব। যা আস্বাদনযোগ্য।

সুন্দর কী, সুন্দর কেন, এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেয় নন্দনতত্ত্ব কিংবা সৌন্দর্যতত্ত্ব। কবির বলা কথা কীভাবে রসাত্মক ও কাব্য হয়ে উঠল তা জানার জন্য নন্দনতত্ত্বের দ্বারস্থ হতে হয়। সৌন্দর্য বা আনন্দ উপলব্ধিই নন্দনতত্ত্বের মর্মকথা।

লক্ষ করলে দেখা যায় বিশ শতকের চারের দশকের কবিতায় কবিদের কলমে নিঃসৃত কাব্য ভাবনার প্রথম নিদর্শন সম্ভবত আমরা পাই সমর সেনের লেখায়। তাঁর কবিতা ভাবনা প্রমাণ করে কবিতা শুধু সৌন্দর্য উপভোগ করার ক্ষেত্র নয় বরং সমাজ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হতাশা-নিরাশার-যন্ত্রণারও শিল্প নির্মাণ।

ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় বলা হয়েছে ‘অপারে কাব্য সংসারে কবিরেক প্রজাপতি’। কবি তাঁর ‘অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা’র সাহায্যে কাব্যের মায়াময় জগৎ গড়ে তোলেন। সে জগৎ একান্ত ভাবে কবির নিজস্ব জগৎ। উপাদান তার বিচিত্র। কখনও সমকাল, কখনও পুরাণ কখনও ইতিহাস, কখনও ঐতিহ্য, কখনও রবীন্দ্র অনুসৃতি। কিন্তু অনুভব উপলব্ধি একান্তভাবেই কবির অভিজ্ঞতার সারাৎসার। আসলে প্রত্যেক কবির সৃষ্টি সম্পর্কে নিজস্ব এক দৃষ্টিকোণ থাকে। সোজা কথায় কবির কাব্যভাবনা স্বকীয়। কেউ প্রকাশ করেন প্রবন্ধ আকারে কেউবা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তা ব্যক্ত করেন। সমর সেন তাঁর কবিতা ভাবনা ব্যক্ত করেছেন কিছু প্রবন্ধ আকারে কিছুটা তাঁর কবিতা নির্মাণে।

স্রষ্টার সামাজিক প্রতিবেশ, জাতিগত ও দেশজ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার এবং মানসিকতার বিশেষ গঠন মিলে স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের প্রেরণা আসে। তখন থেকেই সৃষ্টি কৌশলের উচ্চারণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি চালিত হয় কবির সচেতন মনের নিয়ন্ত্রিত ভাবনার সাহায্যে। কেননা স্রষ্টার মননে সবসময় একটি শিল্প প্রাসঙ্গিক ভাবনা থাকে। কবি কী করতে চান, কেন করবেন, কীভাবে তা করবেন এই ভাবনা সমূহের সম্মিলিত আখ্যান তাঁর কাব্যচিন্তা। সেখান থেকেই কবির কাব্যের মায়াময় জগৎ। কাব্য চিন্তা তাই কবির সচেতন মনন চর্চার ফল।

কাব্য সৃষ্টি সম্পর্কিত সামগ্রিক ভাবনা ও সচেতনতাই হল কাব্য চিন্তা। কবির কাব্যের বিষয়বস্তু ও প্রসঙ্গ চয়ন করে গড়ে তোলেন নিজেদের কাব্য প্রকরণ। কাব্যের উৎস প্রেরণা ও সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন, কখনও কখনও সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কেও ভাবিত হন। সেখান থেকে বোঝা যায় তাঁদের দৃষ্টিকোণ। কবি ও পাঠকের সম্পর্ক নির্ণয় করবারও চেষ্টা করেন কবির। কবিতার উৎসার সচেতন ও অবচেতন মনের যৌথ ক্রিয়া, কিন্তু কাব্য চিন্তা পুরোপুরি কবির সচেতন মনন-চর্চার দাবি করে।

রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিক কবিরা তাঁদের কাব্যভুবন গড়েছিলেন প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তী কালে। ১৯৩০-১৯৩১ এর পর। ১৯৩৫-১৯৩৬-এ সমগ্র বিশ্বে ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনা ও কিছুটা সাম্যবাদের বাণী জেগে ওঠে। তাই এই সময় পর্বের কবিরা তাঁদের কাব্য প্রেরণার সঙ্গে সেদিনের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিগত উত্তাপকে মিশিয়ে নিয়েছিলেন গভীরভাবে। সেজন্য কাব্য সৃষ্টি সম্পর্কে কবির সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ভাবনা ও সচেতনতাই হল কাব্য চিন্তা। এই কাব্য চিন্তায় কবিরা গুরুত্ব দেন নিজেদের করণ কুশলতাকে। আর কাব্য চিন্তায় এইজন্য প্রধান হয়ে ওঠে- কাব্যের উৎস, প্রেরণা ও সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

আমরা এখন কবি সমর সেনের কাব্যভাবনা ও সেই কাব্য ভাবনা কীভাবে তাঁর কবিতার নন্দনতত্ত্ব হয়ে উঠেছে এই নিয়ে আলোচনা করব। জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন - জীবনের ভয়াবহ স্বাভাবিকতা ও স্বাভাবিক বিষণ্ণতাকে কবিতায় ফুটিয়ে তোলার কথা।

কবিতা ভাবনা প্রসঙ্গে সমর সেন-এর যে কথাটি প্রথমেই মনে আসে তা হল -

“কবিতার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কি সেটা স্পষ্টভাবে বলা কঠিন। অনেকে বলেন কবিতা আসে শুধু অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে। কথাটি বলা সহজ কিন্তু সঠিক নয়। কারণ অন্তঃপ্রেরণা শুধু অন্তরের জিনিস নয়, তার মূল উৎস বিশাল ও বিক্ষুব্ধ বহির্জগৎ।”^১

সমর সেন তরুণ বয়সের প্রেমের অনুভব থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করলেও তাঁর কবিতা চর্চার প্রাথমিক উৎস ছিল ব্যক্তি মানুষের সংঘাত। কবিতা পত্রিকায় প্রথম সংখ্যা থেকে প্রকাশিত কবিতাগুলি যদি লক্ষ করা যায় দেখব যে অধিকাংশই প্রেমের-প্রেমজনিত কামনার এবং বাসনার অতৃপ্ত জনিত বেদনার কবিতা। প্রেম বাসনাময় প্রত্যাক্ষাত এক তরুণ মানুষ তাঁর প্রথম দিকের কবিতায়। কিন্তু কবিতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা কী, তাঁর কবিতায় কেন এত নগর জীবন আবৃত্ত, কেন মধ্যবিত্ত জীবনের এত অসহায় আত্মগ্লানি ও ছটফটানি, মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস কোথা থেকে উচ্চারিত হয় তাঁর এসব কাব্য ভাবনা? এসব বুঝতে গেলে আমাদের অবলম্বন করতেই হবে তাঁর কবিতা। তাঁর স্বীকারোক্তি। সহায়ক ভূমিকা পালন করে তাঁর বাবু বৃত্তান্ত, দিনলিপি ও জুজু কে লেখা চিঠি। বাবু বৃত্তান্ত-এ তিনি লিখেছেন -

“আমার গণ্ডি সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, সে গণ্ডি কখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।”

“জনগণের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল না পরিধি ও পরিবেশ ছিল মধ্যবিত্ত। আমাকে কেউ বিপ্লবী বললে মনে হত এবং এখনও হয় যে বিপ্লবকে হয়ে করা হচ্ছে।”^২

এখান থেকে দুটি কথা স্পষ্ট তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণির গণ্ডি কখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভিতরেই তাঁর কবিতা লেখা এবং জনগণের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ ছিল একথা আমরা মনে নিতে পারি না। কেননা মধ্যবিত্ত পরিধি ও পরিবেশে তিনি কাব্য রচনা করলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তরমহল তাঁর খুবই পরিচিত। জীবনের ভাঙাচোরা দিক তাদের জীবনের কদর্যতা তাদের জীবনে দ্বিচারিতা ও অসহায়তা সবই তাঁর কবিতায়। যুগের অভিশাপে নিষ্পলক চোখে দেখানোর উৎসাহে তিনি বাঁকা চোখে দেখা নেতির শিল্প নির্মাণ করেছেন। ‘বাংলা কবিতা’ প্রবন্ধে লিখেছেন, -

“ভিতরের প্রেরণা যদি কবিতার মূল এবং একমাত্র উৎস হত তাহলে প্রতি বছরে প্রতি মাসে প্রতি সপ্তাহে মহৎ কবিতার রচিত হওয়ার পথে কোন অন্তরায় থাকত না। কাব্যের ইতিহাসে অন্তরায় আসে তার কারণ কবিতা বিশুদ্ধ কল্পনা নয়, পরিবর্তনশীল শ্রেণীগতির স্থান কাল পাত্রের মুখাপেক্ষী এবং মুখাপেক্ষী হলেও মাঝে মাঝে সাহায্য করতে পারে। সামাজিক পরিস্থিতি এবং অন্তঃপ্রেরণার মধ্যকার আত্মীয়তা জটিল কিন্তু অনস্বীকার্য। আমরা একটিকে মারলে অপরদিকে অবহেলা করি। মনে করি কাব্যের ঈশ্বরকে মারলে সমাজের কুণ্ডলকে কে মানা অসম্ভব। ... ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে কাব্যের মূল সূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব এবং মূলসূত্র হীন কাব্য এক ধরনের মস্তিষ্ক বিকৃতির নামান্তর।”^৩

মনে রাখতে হবে ‘ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ‘মূল সূত্র হীন কাব্য এক ধরনের মস্তিষ্ক বিকৃতি’-র পরিপ্রশ্নটি। এর পরেই তিনি আবার লিখেছেন -

“কবিতা অবশ্য ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে এবং ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া বলতে চলতি ভাষায় সাধারণত আমরা হৃদয় আবেগ বুঝি। এই হৃদয় আবেগেরও প্রকারভেদ আছে। বাংলা কবিতার অধিকাংশ এত নির্জীব তার কারণ আমাদের কাব্যে Significant emotion এর একান্ত অভাব।”^৪

লক্ষণীয় ‘হৃদয় আবেগ’ আর সিগনিফিকেট ইমোশন - শব্দ গুচ্ছ। ‘অতি আধুনিক বাংলা কবিতা’ প্রবন্ধে তিনি লিখছেন - “জ্ঞাতসারে কোন কবিতা কিংবা অন্য লেখায় আমি নিজেকে বিপ্লবী বলে জাহির করিনি। উপরন্তু কর্মভীরু পলাতক আধা বাস্তব রোমান্টিক ভাবেই আমার কাব্যের নায়ককে বর্ণনা এবং বিদ্রূপ করে এসেছি। গ্রহণ-এর নাম কবিতায় যে টাইপের জীবন এবং আত্ম পরিক্রমার কথা আছে সেটাই বিপ্লবী নয়, মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতীক।”^৫

এখান থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মুমূর্ষু মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাঁর কবিতায় প্রতিনিধিত্ব করেন।

সমর সেনের কাব্য চিন্তায় একটি বড়ো অংশ কলকাতা শহর। শহরের যাপন চিত্র। এই যাপন তাঁর কবিতায় বেশ সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই নগর জীবনের প্রতিফলন কীভাবে তাঁর কবিতায় আসছে তার উল্লেখ কিন্তু আমরা পাই তাঁর একটি প্রবন্ধে। ‘নানা লেখা’-য় ‘প্রসঙ্গ কলকাতা’ রচনায় নগর জীবনের বহুবর্ণ মানচিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

“একসময় কলকাতায় মানুষ হতে পারলে মানুষ বরাত জোর মনে করত। কিন্তু সেই কলকাতা একসময় আমূল বদলে গেল। জিনিসপত্র দাম বাড়লো ঠিকই তার সঙ্গে দালাল বেশ্যাদের বাজারের হলো রমরমা। বড়লোকের পাড়া বাদ দিলে বাড়ি ঘর ছোট ছোট আর ঘিঞ্জি। বিশাল এক মানুষের বাহিনীর বাস করে খুপরিতে অথবা খোলা জায়গায়। চক্রাকারে চলে তাদের আহার নিদ্রা ঝগড়া প্রেম এমনকী মলমূত্র ত্যাগও। হাজার হাজার মানুষ ফুটপাথে ঘুমোয়। চটকল আর বিচিত্র সব কলকারখানা গোটা অঞ্চলে বসন্তের দাগের মতো কুৎসিত করছে। গঙ্গাতে ঢেলে দিচ্ছি যত রাজ্যের নোংরা ময়লা। এখানে বেকারের সংখ্যা আকাশ ছোঁয়া, আমলাতন্ত্রের মধ্যে ময়ূরের ক্লাসিকাল থাকলেও সর্বোপরি জেগে রয়েছে লোভ আর লাভের শ্যেন চক্ষু।”^৬

এই রকম একটা অবক্ষয়গ্রস্ত বনেদের ওপর শিল্প সাহিত্যের যে সৌধ তিনি গড়ে তোলেন তা ক্ষয়িষ্ণু শহরের বুদ্ধিজীবীর কলমে গড়ে তোলা মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাপ আর নৈরাশ্য বাদের প্রতিফলন। বস্তুত জীবনের পদ্ধতি যে কোনো সমাজ ও সমবায় পদ্ধতির চেয়ে বড়, এরই ভিতরে মানুষের সমবায় ব্যবস্থা বারবার ভেঙে যাচ্ছে ও নতুন ভাবে গড়ে উঠছে।

এটাই সমর সেন শিল্পিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর কবিতায়। তাই নিজের স্বচ্ছন্দ সমগ্রতার উৎকর্ষে মধ্যবিত্ত জীবনের রোমান্টিক ব্যাধি নয়, যাপিত জীবনের গ্লানিময় কদর্য দিক ফুটিয়ে তোলেন কবিতায়।

ধরা যাক ‘একটি বেকার প্রেমিক’ কবিতার কথা। এই কবিতায় ধ্বস্ত অবক্ষয়িত কলকাতা নগরীর ছবি স্পষ্ট। নগর সভ্যতার পতন ও সর্বাত্মক ধ্বংস কবি সমর সেনকে গভীর ভাবে ব্যথিত করে তুলেছিল। তাই কলকাতা নগরীকে তাঁর মনে হয় শূন্য মরুভূমি। -

“কলকাতার ক্লান্ত কোলাহলে

সকালে ঘুম ভাঙে

আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে

বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।”^৭

কিংবা ‘ঘরে বাইরে’ কবিতার কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক উপন্যাস নাম সম্পৃক্ত এ কবিতায় কবির বক্তব্য বিষয় নগর সভ্যতার নগ্নতা ও কুৎসিত চেহারার প্রদর্শন। সেই নগ্নতা কুৎসিত চেহারা এমন ভাবে দেখালেন, যা শিল্প সুসমায় মন্ডিত হয়। চিত্রকল্প প্রয়োগ, উপমার ব্যবহার আর উপস্থাপনার অভিনবত্ব লক্ষণীয়। এখানে নগর সভ্যতার নগ্নতা ও কুৎসিত চেহারা। এতটাই কুৎসিক যে তা অস্বস্তিকর। সেখানে আলকাতরার মতো রাত্রি আসে বিবর্ণ দিন আসে। সেজন্যে এখানে

ক্লাস্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে কবি তাঁর প্রেমিককে নিয়ে চলে যেতে চান এমন এক শান্তির স্বপ্নে, যেখানে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটবে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে। ‘নিরালা’ কবিতায় কবি তাই ব্যক্ত করেন -

“মাঝে মাঝে মনে হয়
দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে
তোমাকে নিয়ে কোথাও সরে পড়ি।
নদীর উপর যেখানে নীল আকাশ নামে
গভীর স্নেহের,
শেয়াল-সঙ্কুল কোনো নির্জন গ্রামে
কুঁড়ে- ঘর বাঁধি;”^৮

গ্রামে ‘সরে পড়ে’ ‘ঘর বাঁধা’ কম কথা নয়। এ আসলে মধ্যবিত্ত যৌবনের স্পর্ধিত স্পর্ধা। যখন মূল্যবোধ হারিয়ে গেছে, কৃষ্ণচূড়া নিষেধে মাথা নাড়ে - তখন নাগরিক মধ্যবিত্ত তার সাধ্য মতো জায়গায় মানুষের থেকে নিরাপদ দূরত্বে শেয়ার সঙ্কুল নির্জন গ্রামে শান্তির কুঁড়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছেন।

আসলে প্রতিটি সময়ের সাহিত্য চিন্তা বিশেষ ভাবেই সেই সময়ের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও শিক্ষিত জনমানুষের মানসিকতার স্তরের উপর নির্ভর করে, চারের দশকের বাঙালি কবি সমর সেন তার কাব্য ভাবনায় সততার সঙ্গে সমকালীন আওয়ার টাইম বা আমাদের সময়ের কথাকেই ব্যক্ত করেছেন তার কবিতায়। সেজন্যেই কাব্য বিষয়ের উপর মধ্যবিত্ত জনগণ আর কবি দৃষ্টিকল্পে সেই মধ্যবিত্ত জনগণের বিকৃত বিলাস অসংগত জীবনকে - শ্লেষবাক্যে ভাষাশিল্প রূপ দান করেন।

যে জনজীবনের কথা তিনি বলেন তাদের বহু বিচিত্র প্রকাশ। সংগ্রাম। বেঁচে থাকার ‘রণকৌশল’। সমর সেনের কবিতায় নিরাশা বা নৈরাশ্য শিল্পমূল্যে অনন্য মাত্রা লাভ করে। সে নৈরাশ্য বা নিরাশা মূলত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনে নৈরাশ্য। নৈরাশ্যের মানুষ তাই নিরাশায় মগ্ন। ধরা যাক ‘চার অধ্যায়’ কবিতার কথা। মধ্যবিত্ত আত্মার কথা থাকলেও ‘চার অধ্যায়’ কবিতায় ব্যক্তি মনের একটি দুঃখ আত্মকেন্দ্রিক নিরাশার উক্তি শিল্পিত হয়।

“একটি মানুষকে ভুলতে কতদিনই আর লাগে কত দিনই বা লাগে
শরীর থেকে মুছে ফেলতে
আর একজনের শরীর সর্বস্ব আলিঙ্গন।”^৯

সাম্প্রতিক কবিতা বিষয়ে তাঁর ভাবনা -

“আজকালকার কবিতার আর একটা বিশেষত্ব নজরে পড়ে। সেটা হচ্ছে কোন কবিতা সমগ্রভাবে হয়তো মনে কিছু দাগ কাটে। কিন্তু কোনো বিশেষ বিশেষ ছবি সব সময় মনে থাকে না অর্থাৎ আবেগ দু একটা ছবিতে কিংবা দুই একটা লাইনে দানা না বেঁধে সমস্ত লেখায় শিথিল ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক সময় মিলিয়ে যায়। ... বুদ্ধি এবং আবেগের সমন্বয়ই কবিতার উৎস।”^{১০}

তাহলে কবি জোর দিলেন বুদ্ধি এবং আবেগের উপর। এই দুই এর সমন্বয় থাকতে হবে কবিতা লেখার উৎসে। সমর সেনের কবিতায়ও কিন্তু আমরা এটা বেশ লক্ষ্য করি। বুদ্ধি এবং আবেগের সমন্বয়। গদ্যের রচনার ভেতর দিয়ে তিনি যে সব কবিতা রচনা করেন তার বেশির ভাগ কবিতাই কিন্তু বুদ্ধির দাবি রাখে।

ধরা যাক তাঁর ‘নষ্ট নীড়’ কবিতার কথা। রবীন্দ্রনাথের এই নামের ছোট গল্প অথবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই নামের কবিতার কথা বাদ দিয়ে বলতে পারি চার ঋতুর প্রসারে- মূলত হেমন্তের পটভূমিতে লেখা উনিশ লাইনের এই কবিতা দুর্ভিক্ষের কবিতা। এ কবিতায় বুদ্ধি ও আবেগের অনন্য সমন্বয়।

৯-১-৯ স্তবকে বিন্যস্ত এ কবিতার নন্দনতত্ত্ব মূলত এর গঠন এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মাঝখানের এক লাইনের স্তবকটি এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হওয়ার ঘূর্ণায়ক বিন্দু (turning point)। প্রথম স্তরে দুর্দিনের আশঙ্কা আছে, দুর্দিন নেই; দ্বিতীয় স্তরে সেই দুর্দিন এসে হাজির -

“কিন্তু দুর্দিন এলো

এ কী দুর্দিন এলো।”

আমরা লক্ষ করি দ্বিতীয় লাইনের শেষে হওয়ার কথা ছিল বিসময়সূচক চিহ্ন (!), কবি তা করলেন না, পরিবর্তে দাঁড়ি (।) চিহ্ন বসালেন। কারণ যে দুর্দিন এসেছে তার তাঁর জানা, আর জানা বলেই বিস্ময়ের কিছু নেই।

কাব্য চিন্তায় সমর সেন নারীকে জীবন পথের বাধা হিসেবে দেখেছেন। তাঁর কাছে নারী প্রেম এক অভ্যস্ত যাপন, নারী মানব প্রগতির অন্তরায়। এই ভাবনা থেকেই সমর সেন চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রতিমা অনন্ত যৌবনা ‘অবন্ধনে’ উর্বশীকে কামনার নারী করে তাঁর কবিতায় প্রতিবিম্বিত করেন। এ যেন যৌনতার অ-নন্দন। অবক্ষয়ের চূড়ান্ত ফুটে উঠে ‘উর্বশী’ কবিতায়। তাঁর কাব্যবিভাস তাই গতানুগতিক চিন্তা ভাবনার সরল রেখায় হাঁটে না। তাঁর চেতনায় রোমান্টিকতা আর ধরা পড়ে না। উর্বশীকে উদ্দেশ্য করে লেখেন -

“তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে

দিগন্তে দূরন্ত মেঘের মতো!”^{১১}

নিজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি, সেই মধ্যবিত্ত যে মধ্যবিত্ত মানুষ তাদের আত্মকেন্দ্রিকতা অক্ষমতা, সংকট, বেকারত্ব, অন্তসারশূন্যতা, অসংযত কাম, দিন যাপনের গ্লানি, সংকীর্ণতা নিয়ে টিকে আছে। এই জন্য ‘চেনা গণ্ডির মধ্যে’ চেনা মধ্যবিত্তের কথাই বলেন তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতা যেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সংগ্রহশালা। ‘একটি বুদ্ধিজীবী’ কবিতায় তিনি লিখলেন-

“ধ্বংসের ক্ষয় রোগের শিক্ষিত নপুংসক মন

সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে

অতৃপ্ত রতি উর্বশীর অভিশাপ।”^{১২}

মধ্যবিত্ত, ধূসর, অন্ধকার, স্তব্ধতা এবং নাগরিক শব্দ তাঁর স্রবভাষ্যে ঘুরে ফিরে আসে। আসলে ১৯৩৫ থেকে নিজের নগর জীবনের প্রতিবেশ তাঁর কবিতায় একটি সামাজিক আবহ নির্মাণ করতে থাকে। কবিকে সচেতন দেখতে পাই নগর জীবন এবং নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের মূল কথা - নগর জীবন কদর্য, নিষ্ফল। মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থেকেও নিরাশ এবং নিষ্ক্রিয়। দিন যাপন তাদের কাছে গ্লানিকর কিন্তু মুক্তিপথের সন্ধানও তারা সচেতন নয়। সেই জন্য ‘নাগরিক’ কবিতায় তিনি লিখছেন -

“মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরা মত রাত্রি...

আর কত লাল শাড়ি আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ

আর হাওয়ায় কত গোল্ডফ্লেকের গন্ধ,

হে মহানগরী! ...

কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে!

কলেরা আর কলের বাঁশি আর গনোরিয়া আর বসন্ত

বন্যা আর দুর্ভিক্ষ

শৃণুস্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।”^{১২ক}

কলেরা, কলের বাঁশি, গনোরিয়া, বসন্ত-গা ঘিনঘিন করা শব্দগুচ্ছ। ঠিক এর পরেই কবি নিয়ে আসেন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বিখ্যাত সুভাষিত-শৃণুস্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ” - বিপরীতের এক অদ্ভুত সহাবস্থান।

এবার আসা যাক সমর সেন এর কবিতায় রাজনৈতিক চেতনা প্রসঙ্গে। আজ ২১ শতকে দাঁড়িয়ে সাহিত্যকে মার্কসবাদী চেতনা বলতে আমরা যে ধরনের সচেতনতা বুঝি ১৯৪০-এর কাছাকাছি সময়ে ঠিক সেভাবে এই চিন্তা রেখা গুলি স্পষ্টতা পায়নি। তবু সমর সেনের কবিতায় মোটামুটি ভাবে সাম্যবাদী চেতনার সুর ধ্বনিত হয়। সাম্যবাদী শিল্প বিশ্বাস এবং সাম্যবাদী রাজনৈতিক দলীয়তা বিষয়ে তাঁর মানস বিবর্তন আমার লক্ষ করি।

সমাজের অবক্ষয়ের রূপ, প্রক্রিয়া ও সূত্র সন্ধানই প্রাধান্য পায় তাঁর কবিতায়। সেখানে সমাজ সচেতন আর বামপন্থী মনোভাব ধরা পড়ে। আমাদের মনে রাখতে হবে নিজের পারিবারিক সাংস্কৃতি পরিমণ্ডলে ছিল মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের আনাগোনা, নিজেও একবার আসানসোলে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক প্রচারে গিয়েছিলেন। আর চারের দশকে কবিদের মতো স্বাভাবিক প্রবণতাতেই তিনি সাম্যবাদী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। যদিও সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি কখনও অংশগ্রহণ করেননি।

“কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেবার চেষ্টা করব কিনা গভীরভাবে চিন্তা করে ঠিক করলাম আমার দ্বারা সক্রিয় রাজনীতি হবে না। বক্তৃতা আমার একেবারে আসে না, তার চেয়ে মাঝে মাঝে বিপ্লবী কবিতা লিখলে ও পার্টিতে কিছু অর্থ সাহায্য করলে বিবেক সাফ থাকবে। আমাকে কর্মী হিসেবে নিলে পার্টির বিশেষ কোনো লাভ হবে না।”^{১০}

ধরা যাক ‘খোলা চিঠি’ কাব্যের ‘ইতিহাস’ কবিতার কথা। যেখানে সাম্যবাদী চেতনা খুব স্পষ্ট। -

“ধানক্ষেতে কাস্তে হাতে কিষাণ

হাতুড়ি বাজে কামারশালে,

সবুজ আগুন জ্বলে অনেক মাঠে, ...”^{১১}

লক্ষণীয় তিনি যেসব কবিতার বই লিখছেন তার এক একটি মাঝে মাঝে তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর বামপন্থী বন্ধুদের - অশোক মিত্রকে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। শুধু তাই নয় এই সময়ের কবিতার ভাষা বলে দেয় বামপন্থার প্রতি তাঁর কী মনোভাব। -

“তবে জবাব তাদের হাতে, এদেশ যাদের,

যারা লাঙলে তিলে তিলে সোনা ফলায়,

কারখানা কলে যারা দধীচির হাড়ে সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে

শহরে শহরে।

দেশে-বিদেশে, বন্যার মুখে জাঙাল বেঁধে

তারা বলে দুনিয়ার দুশমনের প্রতিরোধে

দুনিয়াকো কিষাণ মজদুর মজদুর কিষাণ এক হো।

লক্ষ লক্ষ সৈন্য বলিষ্ঠ জয়গানে

পুঁজিবাদ চূর্ণ হবে সারা দুনিয়ায়,

লুপ্ত হবে এ হিন্দু স্থানে, ...”^{১২}

সমর সেনের কবিতায় একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে এলিয়টের ধরনের রবীন্দ্র অনুসৃতির ব্যাপক প্রয়োগ। এলিয়টের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সমর সেন তার থেকে তাঁর কাব্যচিন্তার উপাদান ও কিছুটা সংগৃহীত হয়েছিল।। বিষ্ণু দে তাঁর ‘রুচি ও প্রগতি’ (১৯৫৬) গ্রন্থের ‘টি.এস. এলিয়টের মহাপ্রস্থান’ প্রবন্ধে লিখেছিলেন - “আত্মসচেতনাতারী মহাকবি এলিয়টের কাছে বাংলা লেখকদের ঋণ গ্রহণ মুখ্যত এই আত্ম সচেতনতার ক্ষেত্রে।”

সমর সেন মনে করেন প্রাচীন বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য রবীন্দ্র রচনার শেষবারের জন্য সধর্মে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। এখন নবচেতনা নিয়ে যে নতুন কবিতা রচিত হবে তার কোনো পূর্ব নিদর্শন নেই। আমাদের কাব্য প্রকৃত ঐতিহ্যহীন। তাই বাংলার মুষ্টিমেয় শিক্ষিতজন দ্বারা গড়ে ওঠা, নিতান্ত মধ্যবিত্ত সমাজের হতাশা ও ব্যর্থতাবাদের কবিতাই স্বাভাবিক।

নিজের এই কাব্য ভাবনায় স্থিত ছিলেন সমর সেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারতীয় প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের তৃতীয় সম্মেলনে ‘In defence of the Decadents’ নামে ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে আরও স্পষ্টভাবে এবং কিছুটা অভিযোগের সুরে তিনি বলেছিলেন যে -

“প্রগতি শিবির থেকে আশাবাদী কবিতা রচনা নির্দেশ দেয়া হয় যার বস্তুতপক্ষে কোন যথাযথ পরিস্থিতি নেই। যদি সত্যের পথে বিশ্বস্ত থাকতে হয় তাহলে বর্তমানকালের হতাশা ও ব্যর্থতার কথাই একজন মধ্যবিত্ত কবি লিখতে পারেন। কারণ তাঁর অভিজ্ঞতায় ও বোধে ওই নৈরাশই সঞ্চারিত। এই সত্যের পথ ধরে একদিন আসবে প্রগতিশীল সাহিত্য - consciousness of decay is also power.”

সমর সেনের এই কাব্য ভাবনা আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে প্রগতিশীল কবিতার যে আদর্শ সমালোচনা তাঁর সামনে ছিল তার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতিজনিত অভিজ্ঞতার মিলন ঘটানো সম্ভব নয়। একই সঙ্গে কবিতাকে জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত আর আশাবাদী বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত রাখা সম্ভব হচ্ছিল না তাঁর পক্ষে। তাই কবিতায় হতাশার কথা বলা যে প্রগতি বিরোধী নয় একথা স্বীকার করে নিয়ে তিনি হতাশার কথা বলে আসলে ইতিবাচক কথা বলতে চেয়েছেন।

ভাষা ভঙ্গিতে, ছন্দ প্রয়োগে, উপমায় স্বতন্ত্র তিনি। আজীবন গদ্যছন্দে লিখেছেন। পদ্যে তিনি লেখেননি। মূলত মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ ভিত্তি করে তাঁর গদ্য ছন্দ এগিয়েছে। চারের দশকের কবিতার মূল লক্ষ্য ছিল সে ভাষা হবে জনতার ভাষা, সে ভাষা হবে মিছিলের ভাষা, সে ভাষা হবে প্রতিবাদের ভাষা, মুক্ত প্রান্তরের ভাষা। সর্বজনকে আবাহনের ভাষা। সমর সেনের কবিতা চর্চায় কিন্তু তার যথেষ্ট অভাব। ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীতে হেঁটেছেন। যেখানে বিশ্বাসের সংকট যেখানে মননের সংকট, বণিক সভ্যতা যেখানে সবকিছু গ্রাস করে নেয় সেখানে ভাষা সরল হতে পারে না। ভাষা তাই জটিল বিমূর্ত। ভাষা ব্যবহারের এই কারণে নিহিত ছিল এরকম একটি ভাবনা যে -

কবিতা কেবল আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের নির্বাদ উন্মোচন হবে না। কবিতা হবে একটি সচেতন শিল্পকর্ম। কবিতা হার্দিক ক্রিয়ার সঙ্গে একটি বৌদ্ধিক ক্রিয়া। তাই তাঁর সব কবিতায় এই ভাব সংযমের আদর্শ দেখা যায়।

সমর সেনের কবিতার একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে ভারতীয় পুরাণের অনুষ্ণ। পুরাণের মধ্য দিয়ে তিনি বক্ষ্য সময়, যুগের ক্লাস্তি, হতাশা প্রভৃতি ধরতে চেয়েছেন। তাই সমর সেন এর কবিতার নন্দনতত্ত্ব আলোচনায় খুবই প্রাসঙ্গিক তাঁর ব্যবহৃত পুরাণ ইমেজগুলি। অগ্নিবর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, মধ্যবিত্ত সমাজ অভিজ্ঞতার বোধে প্রবৃদ্ধ। ঘরে বসে সর্বনাশের ইতিহাস শোনা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সেকাল নয় একালে চরিত্র হয়ে ওঠেন।

তাহলে আমরা বলতে পারি সাম্যবাদী কবি সমর সেনের কবিতায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সাম্যপন্থার সুর আর নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় - আদর্শহীন নীতিহীন জীবন আবৃত্ত। যৌনতা, নিষ্ক্রিয় অদৃষ্ট বাদী সুযোগ সন্ধানী মধ্যবিত্ত তাঁর শ্লেষ গর্ভ আশ্রয়নের লক্ষ্য।

প্রবল সংবেদনশীল কবি দেখেছেন অনিপুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানব জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হতে। দেখেছেন অবিশ্বাসের বাতাবরন। কবির কাছে সেটা শহরের অসুখ।

কিন্তু কবির বিশ্বাস নতুন প্রজন্ম দুর্ভিক্ষ পার হয়ে পাবে এক নতুন দিন আর জনক সূর্যের আশীর্বাদে পরিচ্ছন্ন গ্রাম। নগর জীবনের কবি তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ শুরু করলেন পরিচ্ছন্ন গ্রামের আশ্বাস দিয়ে। তাই ‘লোকের হাটে’ কবিতায় কবি বলছেন -

“আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত কুপের মণ্ডুক,
ছাপোষা মানুষ,
দিনের বিস্মদ মুখে রাত্রে বাড়ি ফিরি।
এ কথা সর্বদা মনে রাখি,
কেননা আমার একান্ত কামনা

তিলকে তাল করার ভ্রান্তি পার হয়ে... সহজ জীবনে সহজ বিশ্বাসে ফেরা।”^{১৬}

আসলে শ্রেণি ত্যাগ সমর সেনের পক্ষে কখনও সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি বলেই তিনি ‘গৃহস্থ বিলাপ’ কবিতায় মধ্যবিত্তের অসহায় হাহাকারের শিল্প ভাষ্য নির্মাণ করেন। বলেন -

“যদি বা পাঠালে পৃথিবীতে

তবে কেন দিলে এত ব্যর্থতা ঠাকুর! ...

তোমাকে জানাই বন্ধু : পথে বাধা পর্বত আকার, ঘুনধরা আমাদের হাড়।”^{১৭}

কবি লক্ষ করেছেন অলাতচক্রে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো আর দীর্ঘ শ্বাস ফেলা ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই। সেজন্য তিনি এই দীর্ঘশ্বাসকেও কবিতার নন্দন করে তোলেন। -

“গাছের যৌবন তবু প্রতি বছর ফেরে

আমরা ক্রমশ ডুবি স্বখাত সলিলে

ও ধ্রুপদী শান্তি আমাদের নয়।

আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই।”^{১৮}

এটা মধ্যবিভক্ত মানুষের হাহাকার - যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সেই যন্ত্রণাও যে শিল্প হতে পারে তার প্রমাণ এ কবিতা। এমনি করেই সচেতন প্রয়াসে বলিষ্ঠ জীবনবাদী কবি সমর সেন তাঁর সামগ্রিক কবিতা-ভাবনাই বৈদ্যুতিক আত্মকৌতুকে তাঁর কবিতায় নিয়ে আসেন। তৈরি হয় নিজস্ব নন্দনবিশ্ব।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, সোমেশ ও দেব সব্যসাচী সম্পাদিত, ‘সংকলিত সমর সেন’, বাংলা কবিতা : সমর সেন, অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০ পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃ. ৮৫
২. চন্দ, পুলক সম্পাদিত বাবু বৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক, বাবু বৃত্তান্ত : সমর সেন, দে'জ পাবলিশিং, সুধাংশু শেখর দে, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৪ পৃ. ৩৬
৩. চট্টোপাধ্যায়, সোমেশ ও দেব সব্যসাচী সম্পাদিত, ‘সংকলিত সমর সেন’, বাংলা কবিতা: সমর সেন, অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃ. ৮৫-৮৬
৪. চট্টোপাধ্যায়, সোমেশ ও দেব সব্যসাচী সম্পাদিত, ‘সংকলিত সমর সেন’, বাংলা কবিতা : সমর সেন, অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃ. ৮৬
৫. চট্টোপাধ্যায়, সোমেশ ও দেব সব্যসাচী সম্পাদিত, ‘সংকলিত সমর সেন’, অতি আধুনিক বাংলা কবিতা : সমর সেন, অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০ পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃ. ৮৮
৬. চট্টোপাধ্যায় সোমেশ ও দেব সব্যসাচী সম্পাদিত, ‘সংকলিত সমর সেন’, প্রসঙ্গ কলকাতা : সমর সেন, অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০ পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃ. ১২৩-১৩২
৭. সেন সমর, সমর সেনের কবিতা, একটি বেকার প্রেমিক : সমর সেন, সিগনেট প্রেস, নলিনী গুপ্ত, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮, পৃ. ৪০
৮. সেন সমর, সমর সেনের কবিতা, নিরালা : সমর সেন, সিগনেট প্রেস, নলিনী গুপ্ত, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮, পৃ. ৪০
৯. সেন সমর, সমর সেনের কবিতা, চার অধ্যায় (চতুর্থ অংশ) : সমর সেন, সিগনেট প্রেস, নলিনী গুপ্ত, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮, পৃ. ৪০
১০. চট্টোপাধ্যায়, সোমেশ ও দেব সব্যসাচী সম্পাদিত সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা : সমর সেন, অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৯২-৯৩
১১. সেন, সমর, সমর সেনের কবিতা, উর্বশী : সমর সেন, সিগনেট, নলিনী গুপ্ত, কলকাতা অষ্টম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮, পৃ. ৪০
১২. সেন, সমর, সমর সেনের কবিতা, একটি বুদ্ধিজীবী : সমর সেন, সিগনেট, নলিনী গুপ্ত, কলকাতা অষ্টম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮, পৃ. ৫০

- ১২ক. সেন সমর, সমর সেনের কবিতা, নাগরিক : সমর সেন, সিগনেট প্রেস, নলিনী গুপ্ত, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮, পৃ. ৩৭-৩৯
১৩. চন্দ পুলক, বাবু বৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক, বাবু বৃত্তান্ত : সমর সেন, দে'জ পাবলিশিং, সুধাংশুশেখর দে, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৪, পৃ. ৪২
১৪. সেন, সমর, 'সমর সেনের কবিতা', ইতিহাস : সমর সেন, সিগনেট প্রেস, নলিনী গুপ্ত, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮, পৃ. ১০২
১৫. সেন, সমর, 'সমর সেনের কবিতা', খোলা চিঠি : সমর সেন, সিগনেট প্রেস, নলিনী গুপ্ত, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮, পৃ. ১০৫
১৬. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুব কুমার, বিষ্ণু দে : প্রবন্ধ সংগ্রহ, টি এস এলিয়টের মহা প্রস্থান : বিষ্ণু দে, (রুচি ও প্রগতি), বিষ্ণু দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৬৩
১৭. সেন, সমর, সমর সেনের কবিতা, লোকের হাতে : সমর সেন, সিগনেট, নলিনী গুপ্ত, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮, পৃ. ১৩৬
১৮. সেন সমর, 'সমর সেনের কবিতা', 'গৃহস্থ বিলাপ':সমর সেন সিগনেট, নলিনী গুপ্ত, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮, পৃ. ১২৮-১৩২
১৯. সেন, সমর, 'সমর সেনের কবিতা', জন্মদিনে : সমর সেন, সিগনেট, নলিনী গুপ্ত, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮, পৃ. ১৪১

Bibliography:

- চক্রবর্তী, সুমিতা, আধুনিক কবিতার চালচিত্র, সাহিত্যলোক, নেপালচন্দ্র ঘোষ, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৮
- চট্টোপাধ্যায় সোমেশ ও দেব সব্যসাচী (সম্পা.), 'সংকলিত সমর সেন', অনুষ্টিপ, অনিল আচার্য, কলকাতা, ২০১০
- চন্দ পুলক (সম্পা.), 'বাবুবৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক : সমর সেন', দে'জ পাবলিশিং, সুধাংশু শেখর দে, কলকাতা এপ্রিল ২০০৪
- ভট্টাচার্য, জগদীশ, 'আমার কালের কয়েকজন কবি', ভারবি, গোপীমোহন সিংহরায়, কলকাতা, ২০০৪
- সেন সমর, 'সমর সেনের কবিতা', সিগনেট, নলিনী গুপ্ত, কলকাতা ১৪০৮